ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

ফোকলোরঃ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের নিবিড় পাঠ

ড. ফরিদা পারভীন কেয়া*

সারসংক্ষেপঃ নৃগোষ্ঠীর ইতিহাসের বাঁকগুলিতে নজর দিলে দেখা যায় যে, জীবন চালনার তাগিদে সমাজের মূল উপাদান মানুষ নিজেদেরকে নানা কাজে সম্পৃক্ত রেখেছে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে নৌ চালনা কিংবা কৃষিকাজ থেকে শিশু পালন সবই মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আয়ত্তে এনেছে। সকল কাজ যেমন একজন মানুষ করেননি তেমনি একটি কাজই সকলে করেননি। সকলের কাঁধের সমন্বয়েই সামাজিক কাজে নানা গতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিও এরই অঙ্গীভূত। ফোকলোরের সাহায্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের বিশেষ ধারণা লাভ করা সম্ভব।

এক

সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনীতির মানদণ্ডের সাহায্যেই সমাজ ও মানুষের উন্নতি ও অবনতি নির্ণীত হয়। রাজতন্ত্র কিংবা স্বৈরতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জাতি ও সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনের সুযোগ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও ক্ষমতালিপ্সু মনোভাব একশ্রেণীর মানুষ নির্মাণ করে যারা নিজেরা ছাড়া অন্যদের মানুষ মনে করতেই দ্বিধা করে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'সুদূর প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা উচ্চ নীচ দুটো শাখায় বিভক্ত, সে কারণে এখানে লোকজীবন এবং লোকসংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।'[১] এই বোধ সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাসরত মানুষকে দ্বিধাবিভক্ত করে; একশ্রেণী ক্ষমতাকে আলিঙ্গন করে রাখে আর অন্য শ্রেণী তাদের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়। রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনার শিকার 'সাধারণ মানুষ' ফোকলোরের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করে।

যদি আমি রাজা হতাম
এরশাদেরই মতন
টুপি জুতা পরে আমি
গাড়ি চড়ে ঘুরতাম
স্বৈরাচারের গান গাইতাম ।[২]

একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মিশেল পাওয়া যায় এই ছড়ায়। রাজা হওয়ার মতো কঠিন ও আয়াসসাধ্য বিষয়ে কথক এখানে সজাগ। ক্ষমতার স্বাদ রাজা বোঝেন আর এই স্বাদ যখন চিরস্থায়ী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন স্বৈরাচারী মনোভাব মহীরুহে পরিণত হয়। ক্ষমতার জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয় সাধারণ জনগণের উপর। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এই চাপিয়ে দেয়া পাথর সরানো প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশের

*ম্যানেজার, নারীর ক্ষমতায়ন, সিডিএ, দিনাজপুর

'সাধারণ মানুষ' কষ্টবোধের এই কুঠুরি থেকে কষ্টগুলোকে অর্গলমুক্ত করেন ফোকলোরের মাধ্যমে।

কিনতে গেনু হাটে
ধান আর পান
একনা করি শুনতে পানু
বিষহরির[৩] গান
জমিদার সাবে বসে আছেন
চাটুকারে গায় গান।[৪]

সমাজে বসবাসরত 'সাধারণ মানুষ' জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত আর বেশি কিছু চায় না। তারা ক্ষমতা ভোগের বাসনা জলাঞ্জলি দেয় মানবিক বোধের কাছে, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ তার লক্ষ্য। উপরের ছড়ায় দেখা যায় দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য কেনাকাটার দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ করেই বিষহরির পালা কানে আসে, জমিদার সাহেব সেখানে বসে আছেন এবং তারই উদ্দেশ্যে গুণগান বর্ষিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এসব পছন্দ করে না। তারা এসব বিষয়ের প্রতিবাদ করতে ফোকলোরের আশ্রয়গ্রহণ করে।

রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশের মুক্তির লড়াইয়ে যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার, যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই বীর সেনানীদের মানসিক সাহায্যের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন 'সাধারণ মানুষ'।

শেখ মুজিব রব তোল
নৌকার পাল তোল
বাঙালি ধর হাল
ইয়াহিয়ার চোখে ঝাল।[৫]

রাজনীতি সচেতন সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার পাশাপাশি নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে ছড়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 'সাধারণ মানুষে'র কথা। শুধু ছড়া নয় ধাঁধাতেও রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি নৌকা
একটি হাল
একটি নাম
কোন নাম?[৬]
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাজনীতি সচেতন সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সার্বভৌমত্ব, পররাষ্ট্রনীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, হানাহানি-সন্ত্রাস-খুন প্রভৃতি অপকর্মের বিরুদ্ধে। সহজ ভাষাবোধ, অসাধারণ উপলব্ধি, বিষয় বৈচিত্র্য ধাঁধার রাজ্যে বিস্তৃত।

তাই তাই তাই
শেখ মুজিব বাংলায় নাই
পাকিস্তানের কারাগারে

কারে যেন আছড়ায় মারে
বলতে পারলে লাখ টাকা
না পারলে চুল কাটা।[৭]
উত্তর: আইয়ুব খান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রথমেই বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ধরে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। কারান্তরীণ শেখ মুজিবুরের উপর মানসিক নির্যাতন চালানো হয়, তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মুক্তিপাগল বাঙালি জাতির জনক কোন আপস না করে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার দুঃশাসন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আসা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের বোঝাতে থাকেন। যাদের উপর ভার দেয়া হয় তাঁকে মানসিক নির্যাতন চালানোর তারাই প্রতিদিন নতুন কথা শুনতে থাকে। এ বিষয়টিই ধাঁধায় 'আছড়ায় মারে' শব্দদ্বয় দ্বারা রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে বাঙালি মুক্তির স্বাদ পায়, স্বাধীনতা পায় মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পরও বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে পারেনি স্বপ্নদ্রষ্টার অকাল মৃত্যুর কারণে। পরবর্তীকালে আরও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়।

দুই

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করে থাকে। সামাজিক নিয়ম-রীতি-আচার-প্রথা পালনের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনগুলির সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করে থাকে। সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা, সমাজ উন্নয়ন-পরিবর্তন-বিবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়গুলির সঙ্গে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়ন বঞ্চিত সামাজিকভাবে অধস্তন মানুষ আমরা যাদের এখানে 'সাধারণ মানুষ' বলছি তাদের রচিত সাহিত্য ফোকলোরের মাধ্যমে সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়।

একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজে সমাজ কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা নির্মিত হয় সমাজের সামগ্রিক চরিত্রের আদলে। সমাজ একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উপস্থাপন করে বলে স্থানিক শাসন কাঠামোও এর মধ্যে আলোচ্য।

মাতবরে গায় গান
চাটুকারে দেয় সুর
উবুত কর্‌্যা লাথি দেন
বাঁশের লাঠি চুর।[৮]

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে মাতবর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও নানাবিধ অন্যায়ের কারণ, ফলাফল বিশ্লেষণ এবং উপযুক্ত বিচারের মাধ্যমে তা

সমাজে বাস্তবায়ন মাতবরের কার্যাবলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিয়ম-কানুনে অভ্যস্ত লোকজনের কাছে অতি সম্মানিত মাতবর চরিত্র যখন নৈতিক স্খলনের মুখোমুখি হয় তখন তাতে ঘৃণার উদ্রেকই শুধু নয় প্রকাশিতও হয়। তবে তথাকথিত উচ্চ বর্গের মাতবরকে 'সাধারণ মানুষ' সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না। তাই তারা মাতবরকে ব্যঙ্গ করতে নিজেদের গোত্রেরই কাউকে ব্যবহার করে। মাতবরের বেসুরো গানে তার চেলা বা চাটুকার যে সুর দেয় তাতে মাতবর ক্ষিপ্ত হয়। এমন বেয়াদবির ফলস্বরূপ চাটুকারের পশ্চাদ্দেশে লাথি দেন মাতবর, এমনকি আঘাতে আঘাতে বাঁশের তৈরি লাঠিও ভেঙে যায়। ছড়ার রচয়িতা সরাসরি মাতবরকে আক্রমণ করতে পারেননি, কারণ সামাজিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই শ্রেণী আক্রান্ত হলে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সামাজিকভাবে শক্তিশালী চরিত্র সব সময়ই 'সাধারণ মানুষে'র আক্রমণের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত। যে-কোনো ভাবে এই শক্তিশালী চরিত্রগুলিকে মাটিতে টেনে আনাই যেন কাজ। কখনও রূপক প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয়, কখনো বা সরাসরি আক্রমণ করে নানা বিদ্রুপ বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়।

কিষাণ পোলা মাস্টার হইছে
লেখাপড়ার বোঝে কি
মাতবর পোলা ঠোলা হইছে
রাইফেল গুলি ঠি ঠি।[৯]

উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু জ্ঞানের চর্চা হয় বলে সামাজিক চরিত্রগুলির বিশ্বাস। কারণ তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জ্ঞান দিয়ে জীবন চালনা করে আসছেন। যেমন একজন কৃষক পুত্র বা কন্যা খুব সহজেই বলতে পারেন যে মেঘের রঙ কেমন হলে বেশি সময় ধরে বৃষ্টি হতে পারে বা পাখির ডাকের সঙ্গে অনাবৃষ্টির কি সম্পর্ক। উপর্যুক্ত বিচারে সমানুপাতিক সম্পর্ক বিবেচনা করা যায় মাতবর ও তার পুত্রের সঙ্গে। অর্থাৎ সামাজিক চরিত্রগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজে যারা 'সাধারণ মানুষ' হিসেবে বিবেচিত তাদের কাছে তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষের কর্ম যেমন বিবেচিত তেমনি তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণে ঈর্ষান্বিত। সহজ সাবলীল জীবন চর্চায় অভ্যস্ত কিন্তু সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কবিরাজ। তিনি অন্যের অসুখ-বিসুখ যেমন ভাল করেন তেমনি অন্যের মঙ্গলেরও চিন্তা করেন। কিন্তু এই চরিত্রের মধ্যে যে সাহিত্য স্রষ্টা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকের বসবাস তা ধাঁধার রচয়িতা ভুলে যাননি। সামাজিক চরিত্রের নামের মধ্যে স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকের বসবাস বলে ধাঁধার সাহায্যে প্রমাণ করা খানিকটা আত্মসুখ লাভের চেষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভাবলে আমার কথা
ডাক পড়ে যথা তথা
যারা করে কাব্য চাষ
আমার মাঝে তাদের বাস
আবার যিনি রাজ্য চালান
তিনিও আমার ভিতরকার।
উত্তর: কবিরাজ[১০]

বিশেষ প্রয়োজনে কবিরাজ শ্রেণীর লোকজনের কদর অনেক বেশি হয়। এমনকি রাজা মহারাজা কিংবা জমিদারের বাড়িতেও তাদের বিশেষ আতিথ্য গ্রহণ করতে দেখা যায় দিনের পর দিন। অতিশয় ধনাঢ্য পরিবারের কারও জীবন-সংহারী ব্যামো উপস্থিত হলে লোকজীবনে কবিরাজের বিকল্প কিছু নেই। আর যদি বিষধর সর্প দংশনের ঘটনা ঘটে তাহলে তো কথাই নেই। অর্থাৎ কবিরাজ সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিশেষ সময়ের। বিশেষ প্রয়োজনের পেশাজীবী বলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের সমীহ করে চলে। যেমন, ময়না পাখিকে খুব আদর করে বাড়িতে পোষ মানানো হয়। একটু একটু করে দিনে দিনে শিস দিয়ে কথা বলতে শেখানো হয়। কবিরাজ ও ময়না পাখি যেমন আদরের তেমনি অতিশয় যত্ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মাতবরের বাড়িতে। বিভিন্ন আচার-প্রথায় করণীয় কিংবা অন্যায় অত্যাচারের শাস্তি নির্ধারণে মাতবরের বাড়িতে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রক্রিয়াকে সালিশ বলা হয়।

এক দুই তিন
বাজাই সাপের বীণ
আঠারো উনিশ বিশ
ময়নাতে দেয় শিস
মাতবরের বাড়ি চল্লিশ জনে
বল করে কি? উত্তর: শালিস[১১]

'গ্রামীণ জীবনে যে বিচার-ব্যবস্থা ছিল তা গ্রাম্য বা স্থানীয় শালিস এবং রাজকীয় বা সরকারি বিচার ব্যবস্থার পর্যায়ভুক্ত ছিল। অন্যায় সাব্যস্ত করা কিংবা দোষীর শাস্তি বিধান করার দায়িত্ব ছিল মোড়ল, মাতবর, কাজি, জমিদার ও রাজার উপর। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সুবিচার হত না।'[১২] অর্থনৈতিক বিবেচনায় উচ্চকোটিতে অবস্থিত না হয়েও কবিরাজের সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। আবার ময়না পাখির সৌন্দর্য বিচারের চেয়ে শিস দেয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী-পেশার চল্লিশ জন লোকের মধ্যে কবিরাজকেও গণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নকোটিতে বসবাসকৃত লোকজন নিজেদেরকে 'সাধারণ মানুষ' ভাবতে রাজি নন। এর উল্টো দৃশ্যও দেখা যায়। তেত্রিশ হাজার দেব-দেবতার সকলে একই শ্রেণীভুক্ত নন। কোনো দেবতা পর্বত প্রমাণ সমস্যাকে নাসিকা বায়ুর তোড়ে দূরীভূত করেন আবার কেউ শুধু একটি কাজ সাধনের জন্যই পূজা গ্রহণ করেন। তাই তাদের অর্ঘ্যদানের আড়ম্বরও হয়ে থাকে আলাদা। অর্থাৎ দেবতারাও 'সাধারণ মানুষে'র বৃত্ত ভাঙতে পারেননি। সর্ব দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমন উপলক্ষে বাঙালি শ্রাবণ মাসের আগেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে থাকে। আয়োজনের বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে ষষ্ঠীপূজায় কিছুই করা হয় না। তাই প্রবাদে দেখা যায়—

দুর্গাপূজায় ঢাক শাঁখ
ষষ্ঠীতে শুধু খোল।[১৩]

দেবতাদের মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক বৃত্তের ফাঁক-ফোকর আছে তেমনি সমাজেও আছে। দিনের বিশেষ সময়ের খাবার গ্রহণের পর আয়েশ করে পানের খিলি মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করা শুধু তাদেরই মানায় যারা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভার, যাদের নিজের চিন্তার চেয়ে অন্যের

ভাবনা ভাবতেই বেশি ভাল লাগে। কিন্তু এই ভাবনায় গঠনমূলকতার চেয়ে অন্যের সমালোচনাই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সামাজিকভাবে বিত্তবানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন 'সাধারণ মানুষে'রা।

'হাতে আছে পানের খিলি[১৪]
মুখে রসের গড়
পরের ভালো দেখলে পরে
বুকটা ধড়ফড়।'[১৫]

শুধু সামাজিক চিন্তা ভাবনাই নয়, সম্ভাব্য সকল দিক থেকেই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী লোকেরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে। এতে লাভবান হয় সমাজের একটি পক্ষ। শোষণে ফুলে ফেঁপে ওঠা এই পক্ষ অন্যায়ের খড়্গ আরও বেশি উঁচু করে ধরেন সামাজিক অধস্তনের প্রতি। ফলত শোষিত 'সাধারণ মানুষ'রা আরও বেশি নির্যাতিত নিপীড়িত হতে থাকে।

তিন

নৈতিকতার মাপকাঠিতে মানুষ নিজেকে কখনই ছোট দেখতে চায় না। তাই যুগে যুগে ধর্মবোধে শক্তিশালী মানুষেরা নিজেদেরকে অনৈতিকতার হাত থেকে রক্ষা করতে ধর্ম ব্যবহার করেছে। ফলে ধর্ম এক পর্যায়ে সংস্কৃতির অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে। ফোকলোর মানুষের জীবন চর্যা ও মানস চর্চার ফলাফল হওয়ায় ধর্মভিত্তিক নানা উপাদান এতে প্রতিফলিত। এসব উপাদান সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাজে চর্চিত। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ফোকলোরের উপাদান রচিত ও চর্চিত হয় এমন মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত ফলাফল সামাজিক নানা অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। আমরা ছড়ায় দেখতে পাই যে বাড়ির ঠিকানা দেয়ার পাশাপাশি নিজের সামাজিক অবস্থার বর্ণনাও দেয়া হচ্ছে। এসব ছড়ায় বাবার পেশা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এবং এতে ভাইয়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। ছড়ার মূলভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আত্মপরিচয় প্রদানের পুরো বিষয়ই ধর্ম কেন্দ্রিক। বসত ভিটা স্কুলের কাছে হলেও ভাই মসজিদে আজান দেয় এবং বাবা নামাজ পড়ায় একথা বলে নিজের ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে নিজেকে সামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণীর প্রমাণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

আমার বাড়ি স্কুলের কাছে
কাঠাত বরই গাছ
আমার ভাইয়ে আযান দেয়
বাপে পড়ায় নামাজ।[১৬]

বসত-বাড়ি স্কুলের কাছে হলেও লেখাপড়া যে সকল সময় স্কুলেই করতে হয় ব্যাপারটি এমন নয়। ধর্মশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভকেই অধিক উপযুক্ত হিসাবে ভাবেন। তাই স্কুলের লোখাপড়াকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার এর সাথে নুরানি চেহারাও যোগ করা হয়েছে। যারা ধর্মশিক্ষা লাভ করেন তাদের চেহারাও সুন্দর হয় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সুন্দর আর অসুন্দরের প্রসঙ্গের মাধ্যমে

মানুষের ভেদরেখা নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে সুন্দর অসুন্দরের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। এই কর্তৃত্বকারী ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তি। অর্থাৎ ধর্ম শ্রেণীহীনতার কথা বললেও ধর্মীয় শিক্ষা শ্রেণীর সূচনা করে।

কাগজে ঘষিলে কলম
স্কুলের পড়া যেমন তেমন
মাদ্রাসার লেখাপড়া
হাতে তসবীহ নূরানী চেহারা।[১৭]

ধর্মশিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও নুরানি চেহারার সাহায্যে ধর্মভিত্তিক শ্রেণী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা লাভের মাধ্যমে নিজেকে যেমন আলাদা শ্রেণীগত হিসেবে নির্মাণ করা যায় তেমনি দেহবর্ণও এর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে সামাজিক নিম্নকোটি নির্মাণে। ধর্ম কেন্দ্রিক তৈজসও ব্যবহৃত হয়েছে উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে।

গুটি গুটি দানা একশ' খানা
বলেনতো দেখি
আমার নামটা কি?
উত্তর: তসবিহ[১৮]

সামাজিক শ্রেণী নির্মাণের যে প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর করে তোলার চেষ্টা করে তাতে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। সমস্যার সহজ সমাধানকে যেমন ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড় করে তোলা হয় তেমনি সৃষ্টিকর্তার শত নাম জপের জন্য ব্যবহৃত তসবিহও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। নিজ ধর্ম কেন্দ্রিক অত্যন্ত ছোট বিষয়ও তুলে ধরার প্রবণতা ও তা বড়ভাবে উপস্থাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে অন্য ধর্মের কোনো কিছুকে ছোটভাবে প্রকাশ করার মানসিকতা প্রকাশ পায়। ধর্মের ছোট থেকে বড় সকল উপাদানই সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ব্যবহৃত।

একটা মাত্র ঘর মানুষ থর থর
সবাই আপন পর
ঢাকে কাঠি সবাই আসে
ধুপচির উপর ধোঁয়া নাচে।
উত্তর: মন্দির[১৯]

আপন ধর্মকে অনেক বড় ভাবে উপস্থাপনের জন্য চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এতে করে অন্য ধর্মকেও যে খানিকটা ছোট করার প্রবণতা থাকে তাও ফুটে ওঠে। ধর্মালয়ে অনেক লোকজন যাতায়াত করবে এবং নির্দিষ্ট শব্দ সংকেত তাদের আগমন ও উপস্থিতি নিশ্চিত করে। এসব লক্ষণের সাহায্যে ধর্মালয়ের আভিজাত্য প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু প্রতিষ্ঠান নয় ব্যক্তিও ফোকলোরে শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে উপজীব্য।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাস
সকলে কয় সর্বনাশ
মুয়াজজিনে কামেল পাস
বেটায় করে সমাজ নাশ।[২০]

দুইটি পরস্পর বিরোধী চরিত্রের একই স্থানে বসবাস অনেক কঠিন। এই বিরোধিতা ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে যদি সামাজিকভাবে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এমন বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন তাহলে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হন। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির পুত্র যদি তাঁর কথা মতো না চলে তাহলে তিনি অন্তহীন লজ্জার সম্মুখীন হন। অর্থাৎ ধর্ম এবং ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তিকে বড় করে দেখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এতে অন্য ধর্ম এবং ধর্মবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ছোট করে দেখার সুযোগ বেড়ে যায়। অর্থাৎ সামাজিকভাবে এমন একটি পরিকাঠামো তৈরি হয়ে ওঠে যার সাহায্যে কোন ধর্মকে এবং ব্যক্তিকে ছোট ও বড় করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়।

ধর্ম হল হক কথা
অধর্ম যথা তথা।[২১]

ধর্ম এবং শুধু ধর্মই পারে সঠিক ও ন্যায়ের কথা বলতে, অন্য কেউ তা পারে না এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভবও নয়। উপর্যুক্ত প্রবাদে ধর্ম ব্যতীত আর সব কিছু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। এই মানসিকতার সাহায্যে সামাজিকভাবে মানুষকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম ভিন্ন আর সব কিছুই শ্রেষ্ঠত্বের বাইরে বলে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যা সমাজ আরোপিত। অর্থাৎ ধর্মকেই সেরা এবং বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ধর্মের প্রতি সহজাত সহানুভূতিও পরিলক্ষিত হয়। 'বাংলাদেশে ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল একই সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে একই জনপদে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বসবাস করেছে। আপন স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়েও সে অন্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে।'[২২]

চার

সমাজের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা কালানুক্রমিক ইতিহাসের সাহায্যে মানুষের মূল্যবোধের প্রকৃত অবস্থান জানা সম্ভব। সামাজিকতার নানা কথা ফোকলোরের মাধ্যমে যুগ যুগান্তর ধরে বয়ে চলে। 'মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।'[২৩] মানুষ সামাজিক সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ বলে ভালো-মন্দ মিলিয়ে রূপক প্রতীকের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। ফোকলোর ও সামাজিক ইতিহাসের এই সম্পর্কই 'সাধারণ মানুষের' মনের কথা অনুপুঙ্খভাবে লোকান্তরের কালের ধুলায় ছড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূচি:

---

১ মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৫২৬

২ নিজস্ব সংগ্রহ। ঝর্ণা রাণী দাস (৪০), পিতা: দিলীপ চন্দ্র দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা:

দিনাজপুর।

৩ নিজস্ব সংগ্রহ। শান্ত রায় (২৪) পিতা: অবিনাশ রায়, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

৪ নিজস্ব সংগ্রহ। আনোয়ারুল ইসলাম (৪২) গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

৫ নিজস্ব সংগ্রহ। শেফালি রাণী দাস (৭০), স্বামী: মতি লাল দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

৬ নিজস্ব সংগ্রহ। সান্তনা রাণী (৩৮), স্বামী: শ্রীকান্ত রায়, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর

৭ নিজস্ব সংগ্রহ। সায়েরা বিবি (২৩), স্বামী: আব্দুল লতিফ, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

৮ নিজস্ব সংগ্রহ। মিনতি রাণী দাস (১৯), পিতা: বিশ্বনাথ দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

৯ নিজস্ব সংগ্রহ। ভারতী রাণী দাস (৪০), স্বামী: নিবারণ চন্দ্র দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

১০ নিজস্ব সংগ্রহ। নির্মল (২৮), পিতা: বিজয় কুমার, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১১ নিজস্ব সংগ্রহ। রোকসানা বেগম (১৮), স্বামী: জুয়েল রানা, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১২ মাহবুবুল হক, *বাংলার লোকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০), পৃ. ১১১

১৩ নিজস্ব সংগ্রহ। জান্নাতুল বেগম (৩৭), স্বামী: আলতাফ হোসেন, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

১৪ পান পাতা মুড়ে খাওয়ার উপযোগী করা।

১৫ নিজস্ব সংগ্রহ। খোদেজা বেগম (৩৫), পিতা: আনছার আলী, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১৬ নিজস্ব সংগ্রহ। মর্জিনা (৩৮), স্বানী: আবু বকর সিদ্দিক, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

১৭ নিজস্ব সংগ্রহ। শ্রী অবিনাশ রায় (৫৮) পিতা: মৃত নমলু বর্মণ, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১৮ নিজস্ব সংগ্রহ। নিবারণ চন্দ্র দাস (৭১) পিতা: ভগি চন্দ্র দাস, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১৯ নিজস্ব সংগ্রহ। নূর ইসলাম (৩১) পিতা: আবুল হোসেন, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

২০ নিজস্ব সংগ্রহ। রোজিনা (২৮), স্বামী: সিদ্দিক হোসেন, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

২১ নিজস্ব সংগ্রহ। হাসিনা টুডু (১৪), পিতা: বাবুল টুডু, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

২২ আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০১), পৃ. ২৩

২৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, *বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়*, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত: *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, *প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ১